সুশীল সমাজের উদ্যোগে গাত্রদাহ মানষিক বৈকল্যের অভিব্যক্তি নয়কি ?

মোঃ জানে আলম* ।

জাতিগতভাবে আমরা এক সর্বগ্রাসী সংকটে নিপতিত। সর্বগ্রাসী একারণে যে, জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আজ আমাদের এ সংকট প্রকট হয়ে আছে। কিন্তু আমাদের মূল সংকট হলো আমাদের ভয়াবহ দারিদ্র। আমাদের এ দারিদ্র যতটুকু বিত্তের ততোধিক চিত্তের। আজ থেকে বহু বছর আগে কবি নজরুল অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলেছিলেন–আমরা বাঙালিরা কেবল ধনে নয়, মনেও কাঙ্গাল। নজরুলের এ উক্তির শতাব্দী বৎসর পরও তা এখনো সমভাবে সত্য, কী ধনে কী মনে আমাদের এ কাঙ্গালিত্ব ঘুচেনি। চিত্ত ও বিত্তের এ কাঙ্গালিত্বের কারণে আমরা একটি পশ্চাৎপদ জাতি। আমাদের বিত্তের এ পশ্চাৎপদতার কারণ আর্থ-সামাজিক, আমাদের চিত্তের পশ্চাৎপদতার কারণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক। আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার কারণ আমাদের বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থার পশ্চাৎপদতা, পরিণামে আমাদের বিত্তহীনতা। স্বাধীনতার সূদীর্ঘ সময় পরও কী শিল্পে, কী কৃষিতে আমরা উৎপাদন ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ঘটাতে পারিনি। ফলতঃ দারিদ্র আমাদের জনগোষ্ঠীর স্থায়ী ললাট লিপি হয়ে আছে ।

আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকট হল আমাদের মূল্যবোধ ও চিন্তা-চেতনার অস্বচ্ছতা-পশ্চাৎপদতা। স্বাধীনতার সুদীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পরেও আমরা এখনো আমাদের আত্মপরিচয়ের সংকট––আমরা বাঙালি না বাঙলাদেশী––সমাধান করতে পারিনি। আমরা এখনো জাতিগতভাবে নির্ধারণ করতে পারিনি, কী হবে আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি––নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ, নাকি ধর্ম-সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ। আমরা এখনো নির্ধারণ করতে পারিনি আমাদের লোকজ সংস্কৃতি তথা আমাদের ঐতিহ্যের সাথে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির (আধুনিক বিশ্ব সংস্কৃতি) দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মাত্রাবোধ। ফলতঃ জাতি হিসাবে আমাদের সামনে সুনির্দিষ্ট কোন দর্শনের আলোকবর্তিকা দেদীপ্যমান নয়। কবি গুরু রবিন্দ্রনাথ বলেছিলেন––Philosophy is the guiding thread of a human life। কিন্তু আজ আমাদের সামনে কোন দর্শন নেই--দর্শন নেই বলে সে দর্শন বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নেই। "উলট-পালট করে দে মা, লুঠেপুঠে খাই" এ যেন আজ আমাদের একমাত্র দর্শন। তাই ঐতিহ্যগতভাবে যতটুকু সুস্থ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা ছিলাম তাও আজ রোগাক্রান্ত। নির্মম ফলশ্রুতিতে ঘুষ-দুর্নীতি-সন্ত্রাস, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি আজ আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে। তার সাথে নতুন করে যোগ হচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদের চুড়ান্ত বিকৃতি--জঙ্গীবাদ । বলাবাহুল্য আমাদের সাংস্কৃতিক রুগ্ণতার এ উপসর্গগুলো সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করেছে আমাদের রাজনীতিকে।

কিন্তু সংকটটা এখানে আরো মারাত্মক একারণে যে, শারিরীকভাবে অসুস্থ রোগীকে যত সহজে ডাক্তারের কাছে নেওয়া যায়, মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন রোগীকে তত সহজে ডাক্তারের কাছে নেওয়া যায়না, তাকে ঔষধ সেবন করানোও কষ্টসাধ্য। কারণ সে মানতে চায়না সে অসুস্থ। সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হল একটি জাতির সামগ্রিক মানষিক পরিমন্ডলের বিষয়। তাই বলা চলে, আমাদের জাতি আজ মানসিক বৈকল্যে আক্রান্ত। যে কারণে আমরা বুঝতে পারিনা যে, আমাদের মানসিক বৈকল্য ঘটেছে, সে কারণে বিদ্যমান এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমরা রাজনৈতিক পরিবর্তন তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালাবদলের জন্য যত উদগ্রীব, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রশ্নে ততোধিক নির্বিকার ও নিস্পৃহ। একই কারণে আমাদের মানসিক বৈকল্য ঘুচাতে সমাজের সচেতন, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের একটি গোষ্ঠী কোন উদ্যোগ নিলে আমাদের মনে হয় তারা বাড়াবাড়ি করছে, অনধিকার চর্চা করছে কিংবা কোনরকম দূরভিসন্ধি––আমাদের ক্ষমতার তালুকদারীতে ভাগ বসানোর ইচ্ছা––তাদের মনে কাজ করছে। তাই নাগরিক সমাজের যোগ্য প্রার্থী মনোনয়নের পক্ষে যে প্রচারাভিযান তা আমাদের অনেকের গাত্রদাহের জন্ম দিয়েছে। প্রচুর লেখালেখি চলছে এ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। কোন কোন বিদগ্ধজন "লন্ঠন হাতে যোগ্যপ্রার্থী খোঁজা" বলে বিদ্রুপ করেছে। কোন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বতো তাকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। এটা মানসিক বৈকলের অভিব্যক্তি নয় কি ?

একটি সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো যেমন নির্ভর করে তার অবকাঠামো তথা তার উৎপাদন ব্যবস্থার উপর––যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সমাজের উপরি কাঠামো তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ, আবার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশও অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা পালন করে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে ঠিকিয়ে রাখতে কিংবা তাকে পরিবর্তন করতে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, নোতুন চিন্তা, নোতুন মূল্যবোধই একটি সমাজের মানুষকে নতুন আকাঙক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে, পবিবর্তনের শক্তি সৃষ্টি করে, বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনে। আজ আমাদের সমাজের অবস্থা হল, আমরা আর্থ-সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ বলে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবেও পশ্চাৎপদ। আবার আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতাকে দীর্ঘস্থায়ী করছে, নোতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে হিমাচলসম প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে আমাদের জাতি পশ্চাৎপদতার এক দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের আর্থ-সামাজিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংকটের সমাধান করতে হবে যুগপৎভাবে । আর্থ-সামাজিক সংকট সমাধানের প্রধান উপায় কিন্তু রাজনৈতিক, পক্ষান্তরে সামাজিক-

সাংস্কৃতিক সংকট সমাধানের উপায় হলো সাংস্কৃতিক। তাই আজ যে কথাটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, তাহলো কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল আমাদের এ সংকট থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবেনা। এ জন্য আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অব্স্থার পরিবর্তনের জন্য চাই একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আমরা যারা নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তি মনে করি তারাও কী উপরোল্লিখিত সামাজিক সাংস্কৃতিক রোগের উপসর্গগুলো থেকে মুক্ত? একাত্তুরে যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল বা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল তারাও কী বিদ্যমান রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিতে আক্রান্ত নয় ? তারাও কী নিছক রাজনৈতিক ফায়দার আশায় আমজনগণের এ পশ্চাৎপদ মূল্যবোধে লালন কিংবা তাতে জল সিঞ্চন করছেনা? একটু নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে এ প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। কারণ আমাদের যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা, তাতে আমরা অনেকেই শুধু আক্রান্ত নই, বরং তাদের আমরা লালন করছি হীন রাজনৈতিক স্বার্থে--ভোটের রাজনীতির কারণে। হীন রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও আমাদের অনেকের এ অবস্থানের আরেকটি কারণ হলো, অজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তার অস্বচ্ছতা ও আড়ষ্টতা। সামগ্রিকভাবে শিকড়-নাড়া একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছাড়া এ রোগ থেকে কী আমজনগণের, কী রাজনৈতিক নেতৃত্বের, কারো মুক্তি ঘটবেনা। কী ভাবে সে অপরিহার্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্ভব এবং তার রণনীতি ও রণকৌশল কী হতে পারে? রণনীতি হতে পারে–চিন্তার মুক্তি। রণকৌশল হতে পারে-- আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ সৃষ্টি, সকল প্রকার কুসংস্কার--নিয়তিবাদ--অদৃষ্টবাদ-ধর্মান্ধতা, মতান্ধতা, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তিপুজা,পরিবারতন্ত্র সহ সকল প্রকার অপসংস্কৃতি থেকে আম জনগণকে মুক্ত করা। আমাদের নাগরিক সমাজের একটি সচেতন অংশ যদি যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ের প্রচার চালিয়ে আমাদের আমজনগণকে কিঞ্চিৎ হলেও কাল টাকার মালিক, সন্ত্রাসীদের গডফাদার, ঋণখেলাফি, দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সচেতন করতে পারে––হউক না তা খুব সীমিত পর্যায়ে–– তাতে দেশপ্রেমিক সৎ মানুষদের উষ্মা প্রকাশ করা কেন? তাহলে তারা কী এ অবস্থার পরিবর্তনের যে কোন উদ্যোগের বিরোধীতা করবেন? আশার কথা হলো এতদসত্ত্বেও এ জাতীয় কিছু আন্দোলন ইতোমধ্যেই আমাদের সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে। আজ সুশীল সমাজ সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের নামে যে আন্দোলন শুরু করেছে তার পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন সেমিনার-মতবিনিময়ের মাধ্যমে সূশাসনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশলান, বাংলাদেশ (টিআইবি) ও একটি ফ্রন্টে, বিশেষভাবে অর্থনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। এগুলো অবশ্যই সাংস্কৃতিক আন্দোলন, তবে অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে। তাকে যেমন তৃণমূলে নিতে হবে, তেমনি তার পরিধিও আরো অনেক বিস্তৃত করতে হবে। সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে আমাদের আরো বহু ফ্রন্টে যুগপৎ লড়াই শুরু করতে হবে। "সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন" নামক সম্প্রতি দেশের কতিপয় প্রতীতযশা বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংগঠন বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা এসকল আন্দোলনকে এক কেন্দ্রে সমন্বিত করে এ কাঙ্ক্ষিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি মঞ্চ হিসাবে কাজ করতে পারে। আশু করণীয় হিসাবে এ সংগঠনটি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার তথা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রচার-প্রচারণা শুরু করতে পারে। কারণ এ সমস্ত মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ আজ আমাদের উন্নয়ন অগ্রগতি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এমনকি স্বাধীনতার জন্যও হুমকী সৃষ্টি করছে এবং দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের উপর এ অপসংস্কৃতির প্রভাব ক্রমবর্ধমান। তাই একথা আজ নির্দ্বিধায় বলা যায়, জাতীয় পশ্চাৎপদতার এ অচলায়তন থেকে মুক্তি পেতে যুগপৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের কোন বিকল্প নেই। সচেতন নাগরিক সমাজ, বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক কর্মীদের পক্ষ থেকে এ আন্দোলন আরো জোরদার করা যায়। একাত্তুরের মুক্তিযোদ্ধাদের মত এখন আমাদের বড় দরকার একদল সাংস্কৃতিক যোদ্ধার।

* মোহাম্মদ জানে আলম।
গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক,
গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি।